পুঁজিবাদ বনাম ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনী

সূচীপত্র

১. ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও পুঁজিবাদের মধ্যে পার্থক্য ৫

এক ঃ উপার্জনের বৈধ অবৈধের পার্থক্য ৫

দুই ঃ ধন সঞ্চয়ের নিষেধাজ্ঞা ৭

তিন ঃ অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ ৮

চার ঃ যাকাত ১৩

পাঁচ ঃ মীরাসী আইন ১৭

ছয় ঃ গনীমতলব্ধ সম্পদ ও বিজিত সম্পত্তি বন্টন ১৭

সাত ঃ মিতব্যয়িতার নির্দেশ ১৯

২. শ্রম সমস্যা ও তা সমাধানের পথ ২২

বিকৃতির কারণ ২২

আসল প্রয়োজন ২৩

সমস্যার সমাধান ২৪

সংস্কারের মূলনীতি ২৭

ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও তার মূলনীতি

পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ইসলাম যে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক মতাদর্শ অবলম্বন করেছে তার ভিত্তিতে একটি কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সে নৈতিক শক্তি ও আইন উভয়ের সাহায্য নিয়েছে। নৈতিক শিক্ষার সাহায্যে সে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মন-মানসকে এ ব্যবস্থার স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য করার জন্য তৈরী করে। অন্যদিকে আইনের বলে তাদের ওপর এমন সব বিধি-নিষেধ আরোপ করে যার ফলে তারা এ ব্যবস্থার চৌহদ্দীর মধ্যে নিজেদেরকে আটকে রাখতে বাধ্য করে এবং এর সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে সক্ষম হয় না। এ নৈতিক বিধি-বিধান ও আইনসমূহ হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। এগুলো এবং এই ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করার জন্য এ সবের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

এক ঃ উপার্জন মাধ্যমে বৈধ-অবৈধের পার্থক্য

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হচ্ছে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অর্থ উপার্জন করার অবাধ সুযোগ দেয় না। বরং উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ ও অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি করে। এ পার্থক্যের একটা মূলনীতি রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, ধন উপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বিত হলে এক ব্যক্তির লাভ ও অন্য ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয় তা সবই অবৈধ। অন্যদিকে যেসব উপায় অবলম্বন করলে ধন-উপার্জন প্রচেষ্টার সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ন্যায়সংগত সুফল ভোগ করতে পারে তা সবই বৈধ। এ মূলনীতিটি কুরআন মজীদে নিম্নোক্তভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ق وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ط ـ(النساء :

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারো। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে (অথবা পরস্পর পরস্পরকে) ধ্বংস করো না। আল্লাহ তোমাদের অবস্থার প্রতি করুণাশীল। যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে যুলুম সহকারে এরূপ করবে তাকে আমি অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করবো।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৯-৩০)

এ আয়াতে পারস্পরিক লেনদেনকে ব্যবসায় বলা হয়েছে। পারস্পরিক সম্মতিকে এর সাথে শর্ত হিসেবে সংযুক্ত করে এমন সব লেনদেনকে অবৈধ গণ্য করা হয়েছে যার মধ্যে চাপ সৃষ্টি ও প্রতারণার কোনো উপকরণ থাকে অথবা এমন কোনো চালবাজী থাকে যা দ্বিতীয় পক্ষ জানতে পারলে এ লেনদেনে নিজের সম্মতি প্রকাশে কোনো দিনই প্রস্তুত হবে না। এরপর আরো জোর দেয়ার জন্য বলা হয়েছে, "তোমরা পরস্পরকে ধ্বংস করো না।" এর দুটি অর্থ হতে পারে। এ দুটি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমরা একে অন্যকে ধ্বংস করো না এবং দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি নিজের লাভের জন্য অন্যের সর্বনাশ করে সে যেন তার রক্তপান করে এবং পরিণামে সে এভাবে নিজের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে।

এ নীতিগত নির্দেশটি ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অর্থ উপার্জনের নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোকে হারাম গণ্য করা হয়েছে ঃ

০ উৎকোচ (আল বাকারা ১৮৮ আয়াত)।

০ ব্যক্তি সমষ্টি নির্বিশেষে সবার সম্পদ আত্মসাৎ (আল বাকারা ২৮৩ ও আলে ইমরান ১৬১ আয়াত)।

০ চুরি (আল মায়েদা ৩৮ আয়াত)।

০ এতিমের অর্থ অন্যায়ভাবে তসরুফ (আন নেসা ১০ আয়াত)।

০ ওজনে কম করা (আল মুতাফফিফীন ৩ আয়াত)।

০ চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপকরণসমূহের ব্যবসায় (আন নূর ১৯ আয়াত)।

০ বেশ্যাবৃত্তি ও দেহ বিক্রয় লব্ধ অর্থ (আন নূর ২, ৩৩ আয়াত)।

০ মদ উৎপাদন, মদের ব্যবসায় ও মদ পরিবহন (আল মায়েদা ৯ আয়াত)

০ জুয়া ও এমন সব উপায়-উপকরণ যেগুলোর মাধ্যমে নিছক ঘটনাচক্রে ও ভাগ্যক্রমে একদল লোকের সম্পদ অন্য একদল লোকের নিকট স্থানান্তরিত হয় (আল মায়েদা ৯০ আয়াত)।

০ মূর্তিগড়া, মূর্তি বিক্রয় ও মূর্তি উপাসনালয়ের সেবা (আল মায়েদা ৯০ আয়াত)।

০ ভাগ্য গণনা ও জ্যোতিষির ব্যবসায় (আল মায়েদা ৯০ আয়াত)।

০ সুদ খাওয়া (আল বাকারা ২৭৫, ২৭৮ থেকে ২৮০ এবং আলে ইমরান ১৩০ আয়াত)।

দুই ঃ ধন সঞ্চয়ের নিষেধাজ্ঞা

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হচ্ছে এই যে, বৈধ উপায়ে যে ধন উপার্জন করা হবে তা পুঞ্জীভূত করে রাখা যাবে না। কারণ এর ফলে ধনের আবর্তন বন্ধ হয়ে যায় এবং ধন-বণ্টনে ভারসাম্য থাকে না। যে ব্যক্তি ধন সঞ্চয় করে রাশীকৃত ও পুঞ্জীভূত করে রাখে সে নিজে যে কেবল মারাত্মক নৈতিক রোগে আক্রান্ত হয় তাই নয় বরং মূলত সে সমগ্র মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটি জঘন্যতম অপরাধ করে। এর ফল তার নিজের জন্যও খারাপ হয়। এজন্য কুরআন কার্পণ্য এবং কারুনের ন্যায় সম্পদ কুক্ষিগত ও পুঞ্জীভূত করে রাখার কঠোর বিরোধিতা করেছে। কুরআন বলে ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط -(ال عمران : ١٨٠)

"যারা আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহে কৃপণতা করে, তারা যেন একথা মনে না করে যে, তাদের এ কাজ তাদের জন্য মঙ্গলজনক বরং প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮০)

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ٧ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○(التوبة :

"যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪)

একথা পুঁজিবাদের ভিত্তিতে আঘাত হানে। উদ্বৃত্ত অর্থ জমা করে রাখা এবং জমাকৃত অর্থ আরো অধিক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহে খাটানো—এটিই হচ্ছে পুঁজিবাদের মূল কথা। কিন্তু ইসলাম আদতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ জমা করে রাখা পছন্দ করে না।

তিন ঃ অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ

সঞ্চয় করার পরিবর্তে ইসলাম অর্থ ব্যয় করার শিক্ষা দেয়। কিন্তু ব্যয় করার অর্থ বিলাসিতা ও আয়েশ-আরামের জীবনযাপন করে দু' হাতে অর্থ লুটানো নয়। বরং ব্যয় করার ক্ষেত্রে আল্লাহর পথের শর্ত আরোপ করে। অর্থাৎ সমাজের কোনো ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কাজে তা ব্যয় করতে হবে। এটিই হবে আল্লাহর পথে ব্যয়।

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط (البقرة : ٢١٩)

"তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তারা কি ব্যয় করবে ? তাদেরকে বলে দাও, যা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত (তাই ব্যয় করো)।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৯)

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ـ

"আর সদ্ব্যবহার করো নিজের মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন, অভাবী-মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, নিজের মোলাকাতি বন্ধুবর্গ, মুসাফির ও মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সাথে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৬)

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○(الذريات : ١٩)

"তাদের অর্থ সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে।"

–(সূরা আয যারিয়াত ঃ ১৯)

এখানে এসে ইসলাম ও পুঁজিবাদের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়।

বিত্তবান মনে করে, অর্থ ব্যয় করলে দরিদ্র হয়ে যাবে এবং সঞ্চয় করলে বিত্তশালী হবে। কিন্তু ইসলাম বলে, অর্থ ব্যয় করলে কমে যাবে না বরং বরকত ও বৃদ্ধি হবে।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ط ـ(البقرة : ٢٦٨)

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের ন্যায় লজ্জাকর কাজের হুকুম দেয় কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট মাগফেরাত ও অতিরিক্ত দানের ওয়াদা করেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৮)

বিত্তবান মনে করে কোনো কিছু ব্যয় করা হলে তা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে, না, তা নষ্ট হয়ে যায়নি বরং তার সর্বোত্তম লাভ তোমাদের নিকট ফিরে আসবে।

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ ○(البقرة : ٢٧٢)

"সৎকাজে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তা তোমরা পুরোপুরি ফেরত পাবে এবং তোমাদের ওপর কোনোক্রমেই যুলুম করা হবে না।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭২)

وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ○ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط ـ(الفاطر : ٢٩-٣٠)

"যারা আমার প্রদত্ত রেজেক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন একটি ব্যবসায়ের আশা রাখে, যাতে কোনোক্রমেই লোকসানের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তাদেরকে এর বিনিময়ে পুরোপুরি ফল প্রদান করবেন বরং মেহেরবানী করে তাদেরকে কিছু বেশী দান করবেন।"
–(সূরা আল ফাতির ঃ ২৯-৩০)

বিত্তবান মনে করে, সম্পদ আহরণ করে সুদী ব্যবসায়ে নিয়োগ করলে সম্পদ বেড়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে, না, সুদের মাধ্যমে বরং সম্পদ কমে যায়। সৎকাজে অর্থ নিয়োগ করলেই সম্পদ বেড়ে যায়।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ط ـ(البقرة : ٢٧٦)

"আল্লাহ সুদ নির্মূল করেন ও দান-সাদকাকে প্রতিপালন ও ক্রমবৃদ্ধি করেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৬)

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○ (الروم : ٣٩)

"তোমরা এই যে সুদ দাও মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির আশায়, জেনে রাখো, আল্লাহর নিকট তা কখনো বৃদ্ধি লাভ করে না। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাকাত বাবদ যে অর্থ দান করে থাকো একমাত্র তার মধ্যেই ক্রমবৃদ্ধি হয়ে থাকে।"–(সূরা আর রূম ঃ ৩৯)

পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী এটি আর একটি নতুন মতবাদ। ব্যয় করলে অর্থ বেড়ে যাবে এবং ব্যয়িত অর্থ কেবল নষ্টই হবে না বরং কিছুটা অতিরিক্ত লাভ ও কল্যাণসহ পূর্ণ মাত্রায় ফিরে আসবে, অন্যদিকে সুদী ব্যবসায় অর্থ বৃদ্ধির পরিবর্তে অর্থ হ্রাস ও লোকসানের সূচনা করবে এবং যাকাত ও সাদকার মাধ্যমে অর্থ হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে—এ মতবাদটি আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভূত ও বিস্ময়কর মনে হবে। শ্রোতা মনে করে সম্ভবত এগুলো নিছক আখেরাতের সওয়াবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। নিসন্দেহে আখেরাতের সওয়াবের সাথে এসব কথার সম্পর্ক রয়েছে এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এটিই আসল গুরুত্বের অধিকারী। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এ দুনিয়াতেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এ মতাদর্শটি একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর

প্রতিষ্ঠিত। ধন সঞ্চয় করে সুদী ব্যবসায়ে নিয়োগ করার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ চতুর্দিক থেকে ধন আহরিত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে চলে আসবে। সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা প্রতিদিন কমে যেতে থাকবে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় সর্বত্র মন্দাভাব দেখা দেবে। জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে। অবশেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যার ফলে পুঁজিপতিরাও নিজেদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ অর্থ উৎপাদনের কাজে লাগাবার সুযোগ পাবে না।[১] বিপরীত পক্ষে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করলে এবং যাকাত ও সাদকা দান করলে পরিণামে জাতির সকল ব্যক্তির হাতে এ সম্পদ ছড়িয়ে পড়ে, প্রত্যেক ব্যক্তি যথেষ্ট ক্রয়-ক্ষমতার অধিকারী হয়, শিল্পোৎপাদন বেড়ে যায়, সবুজ ক্ষেতগুলো শস্যে ভরে ওঠে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়, হয় তো কেউ লাখপতি-কোটিপতি হয় না কিন্তু সবার অবস্থা সচ্ছল হয় এবং পরিবারই হয় সমৃদ্ধিশালী। এ শুভ পরিণাম সম্পন্ন অর্থনৈতিক মতাদর্শটির সত্যতা যাঁচাই করতে হলে আমেরিকার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।[২] সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কারণে সেখানে ধন বণ্টনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে এবং শিল্প ও বাণিজ্যের মন্দাভাব জাতির অর্থনৈতিক জীবনকে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দিয়েছে। এর তুলনায় ইসলামী যুগের প্রথম দিকের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যখন সেখানে পূর্ণাংগরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে জাতীয় সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার ফলে লোকেরা যাকাত গ্রহীতাদেরকে খুঁজে বেড়াতো কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পাওয়া যেতো না। এমন একজন লোকের সন্ধান পাওয়া যেতো না যে, নিজেই যাকাত দেয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জন করেনি। এ দু'টি অবস্থাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে আল্লাহ সুদকে কিভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সাদকাকে ক্রমোন্নতি ও ক্রমবৃদ্ধি দান করেন তা দ্ব্যর্থহীনভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

ইসলাম পুঁজিবাদী মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক মানসিকতা সৃষ্টি করে। পুঁজিপতি একথা কল্পনাই করতে পারে না যে, সুদ ছাড়া এক ব্যক্তি তার অর্থ সম্পদ আর এক ব্যক্তিকে কেমন করে দিতে পারে। সে অর্থ ঋণ দিয়ে তার বিনিময়ে কেবল সুদই আদায় করে না, বরং নিজের মূলধন ও তার সুদ আদায়

---

১. রসূলে করীম (স) নিম্নোক্ত হাদীসটিতে একথার প্রতিই ইংগিত করেছেন ঃ

ان الرباوان كثر فان عاقبة تصير الى قد ـ(ابن ماجه ـ بيهقى ـ احمد)

অর্থাৎ "সুদের পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন অবশেষে তা কম হতে বাধ্য।"

২. এ গ্রন্থ প্রণয়নের সময় আমেরিকায় যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

করার জন্য ঋণগ্রহীতার বস্ত্র ও গৃহের আসবাবপত্রাদি পর্যন্ত ক্রোক করে নেয়। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, অভাবীকে কেবল ঋণ দিলে হবে না বরং তার আর্থিক অনটন যদি বেশী থাকে তাহলে তার নিকট কড়া তাগাদা করা যাবে না, এমন কি ঋণ আদায়ের ক্ষমতা না থাকলে তাকে মাফ করে দিতে হবে।

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ (البقرة : ٢٨٠)

"ঋণ গ্রহীতা যদি অত্যধিক অনটন পীড়িত হয় তাহলে তার অবস্থা সচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত তাকে সুযোগ দাও আর যদি তাকে মাফ করে দাও তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা কিছু জ্ঞান রাখতে, তাহলে এর কল্যাণকারিতা উপলব্ধি করতে পারতে।"-(সূরা বাকারা ঃ ২৮০)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পারস্পরিক সাহায্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রথমে পারস্পরিক সাহায্য সমিতির তহবিলে অর্থ দাখিল করে আপনাকে তার সদস্য হতে হবে, তারপর আপনার যদি কখনো অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে সমিতি বাজারে প্রচলিত সাধারণ সুদের হারের তুলনায় কিছু কম হারে আপনাকে সুদী ঋণ দেবে। যদি আপনার কাছে অর্থ না থাকে তাহলে পারস্পরিক সাহায্য সমিতি থেকে আপনি কোনোই সাহায্য পেতে পারেন না। বিপরীত পক্ষে ইসলাম যে পারস্পরিক সাহায্যের পরিকল্পনা রাখে তা হচ্ছে এই যে, অর্থ ও সামর্থবান লোকেরা প্রয়োজনের সময় কেবল তাদের কম সামর্থবান ভাইদেরকে ঋণ দেবে না বরং তাদের ঋণ আদায় করার ব্যাপারেও সামর্থ অনুযায়ী তাদেরকে সাহায্য করবে। তাই 'আলগারেমীনা' অর্থাৎ ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায় করে দেয়াকেও যাকাতের অন্যতম ব্যয় ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

পুঁজিপতি কখনো সৎপথে কোনো অর্থ ব্যয় করলে নেহাত লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই তা করে থাকে। কারণ এ সংকীর্ণচেতা ব্যক্তি মনে করে যে, এ অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে কমপক্ষে সুনাম ও সুখ্যাতি তার অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু ইসলাম বলে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা উচিত নয় এবং প্রকাশ্যে বা গোপনে যা-ই ব্যয় করা হোক না কেন অবিলম্বে কোনো না কোনো আকারে এর প্রতিদান পাওয়া যাবে, এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্য যেন এর পিছনে না থাকে। বরং কাজের পরিণতির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এ দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করা যাবে সর্বত্রই দেখা যাবে এ ব্যয়িত অর্থ সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং একের পর এক মুনাফা দিয়েই চলছে।

"যে ব্যক্তি লোক দেখাবার উদ্দেশ্যে নিজের অর্থ ব্যয় করে তার এ কাজকে এমন একটি প্রস্তর খণ্ডের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যার ওপর ছিল মাটির আস্তরণ, সে এ মাটির মধ্যে বীজ বপন করেছিল কিন্তু পানির একটি প্রবাহ আসলো এবং সমস্ত মাটি ধুয়ে নিয়ে চলে গেলো। আর যে ব্যক্তি নিজের নিয়ত ঠিক রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করে তার এ কাজকে এমন একটি উৎকৃষ্ট জমির সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যেখানে একটি উদ্যান রচনা করা হয়েছে, বৃষ্টি হলে সেখানে দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হয় আর বৃষ্টি না হলে নিছক ছোটখাট একটি স্রোতধারা তার জন্য যথেষ্ট।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৩৬ রুকূ)

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ج وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط ـ(البقرة : ٢٧١)

"যদি প্রকাশ্যে সাদকা দাও তাও ভালো কিন্তু যদি গোপনে দাও এবং দরিদ্রদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও, তাহলে এটিই উত্তম হবে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭১)

পুঁজিপতি যদি কখনো সৎকাজে কোনো অর্থ ব্যয় করে তাহলে তার পিছনে তার হৃদয়িক আবেগ ও সদিচ্ছা থাকে না বরং অনিচ্ছাকৃতভাবেই করে থাকে এবং এজন্য সে সবচেয়ে নিকৃষ্টমানের সম্পদ ব্যয় করে, তারপর নিজের শাণিত বাক্যবাণে বিদ্ধ করে অর্থ গ্রহীতার অর্ধেক প্রাণ বের করে নেয়। বিপরীত পক্ষে ইসলাম সবচেয়ে ভালো সম্পদ ব্যয় করার এবং ব্যয় করার পর নিজের অনুগ্রহ প্রকাশ না করা এমন কি প্রতিদানে কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এ আশাও পোষণ না করার শিক্ষা দেয়।

اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ص وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ ـ(البقرة : ٢٦٧)

"তোমরা যাকিছু উপার্জন করেছো আর যাকিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করো, যেন বাছাই করে নিকৃষ্টতর বস্তু ব্যয় করো না।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭)

لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ـ(البقرة : ٢٦٤)

"অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের সাদকাসমূহ ধ্বংস করো না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৪)

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○ (الدهر : ٨ ـ ٩)

"আর তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মিসকিন, এতিম ও কয়েদীকে আহার করায় এবং বলে, আমরা তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে, (এজন্য) আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রত্যাশী নই।"-(সূরা দাহর ঃ ৮-৯)

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দু'টি মানসিকতার মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান দেখা যাচ্ছে এ প্রশ্ন না হয় বাদই দিলাম। তবুও আমার বক্তব্য হচ্ছে, নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও কল্যাণ ও ক্ষতির এ দু'টি মতাদর্শের মধ্যে কোন্‌টি অধিক শক্তিশালী, নিরেট ও সুদূরপ্রসারী ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর নির্ভুল। অতপর কল্যাণ ও ক্ষতি প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমি ইসলামের যে আদর্শ তুলে ধরেছি সেসব সামনে রেখে ইসলাম কোনো অবস্থায় সুদী কারবারকে বৈধ গণ্য করতে পারে, একথা চিন্তা করার কোনো অবকাশ আছে কি ?

চার ঃ যাকাত

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম যে দৃষ্টিভংগী পেশ করেছে তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ধন একস্থানে পুঞ্জীভূত ও জমাটবদ্ধ হয়ে থাকতে পারবে না ; ইসলামী সমাজের যে কয়জন লোক তাদের উচ্চতর যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের কারণে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ আহরণ করেছে ইসলাম চায় তারা যেন এ সম্পদ পুঞ্জীভূত করে না রাখে বরং এগুলো ব্যয় করে এবং এমন সব ক্ষেত্রে ব্যয় করে যেখান থেকে ধনের আবর্তনের ফলে সমাজের স্বল্প বিত্ত ভোগীরাও যথেষ্ট অংশ লাভ করতে সক্ষম হবে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম একদিকে উন্নত নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শনের শক্তিশালী অস্ত্র প্রয়োগ করে দানশীলতা ও যথার্থ পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার প্রবণতা সৃষ্টি করে। এভাবে লোকেরা নিজেদের মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকে খারাপ জানবে এবং তা ব্যয় করতে উৎসাহী ও আগ্রহী হবে। অন্যদিকে ইসলাম এমন সব আইন প্রণয়ন করে, যার ফলে বদান্যতার এ শিক্ষা সত্ত্বেও নিজেদের অসৎ মনোবৃত্তির কারণে যেসব লোক সম্পদ আহরণ করতে ও পুঞ্জীভূত করে রাখতে অভ্যস্ত হয় অথবা যাদের নিকট কোনো না কোনোভাবে সম্পদ সঞ্চিত হয়ে যায়, তাদের সম্পদ থেকে সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানার্থে কমপক্ষে একটি অংশ অবশ্যই কেটে নেয়া হবে। একেই যাকাত বলা হয়। ইসলামের

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এ যাকাতকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করা হয়েছে, এমনকি একে ইসলামের একটি মূল স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নামাযের পরে এ যাকাতের ওপরই সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে, যাকাত না দেয়া পর্যন্ত তার ঐ সম্পদ হালাল হতে পারে না।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -(التوبة : ١٠٣)

"(হে নবী!) তাদের ধন-সম্পদ থেকে একটি সাদকা গ্রহণ করো, যা ঐ ধন-সম্পদকে পাক-পবিত্র ও হালাল করে দেবে।"–(সূরা তাওবা ঃ ১০৩)

এখানে 'একটি সাদকা' শব্দটি থেকে সাদকার একটি বিশেষ পরিমাণ বুঝা যায়। এ সঙ্গে রসূলে করীম (স)-কে এটি আদায় করার নির্দেশ দেয়ার ফলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাধারণ স্বেচ্ছা প্রদত্ত সাদকা থেকে আলাদা এটি একটি ওয়াজিব ও ফরজ সাদকা অর্থাৎ যাকাত এবং বিত্তশালী লোকদের নিকট থেকে এ সাদকাটি অবশ্যই আদায় করতে হবে। কাজেই এ নির্দেশ অনুযায়ী রসূলে করীম (স) বিভিন্ন প্রকার সম্পদের জন্য নেসাবের (যে সর্বনিম্ন পরিমাণের ওপর যাকাত অপরিহার্য) একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। অতপর নেসাব পরিমাণ বা তদুর্ধ বিভিন্ন প্রকার সম্পদের উপর যাকাতের বিভিন্ন হার নির্ধারণ করেছেন সোনা, রূপা ও নগদ টাকা-পয়সার ওপর শতকরা আড়াই ভাগ এবং কৃষি উৎপাদনের ওপর সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমি হলে শতকরা ৫ ভাগ ও সেচ ব্যবস্থার আওতা বহির্ভূত জমি হলে শতকরা ১০ ভাগ, ব্যবসায় পণ্যের উপর শতকরা আড়াই ভাগ, খনিজ দ্রব্যাদি (নিজস্ব মালিকানাধীন) ও গুপ্ত ধনের উপর শতকরা ২০ ভাগ যাকাত ধার্য করেছেন। এভাবে ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত গবাদি পশু প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণীর ওপর বিভিন্ন হারে যাকাত ধার্য করেছেন।

আয়াতের শেষ শব্দটি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বিত্তশালী ব্যক্তির নিকট যে অর্থ সম্পদ সঞ্চিত হয় ইসলামের দৃষ্টিতে তা অপবিত্র এবং তার মালিক তা থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে একটি বিশেষ পরিমাণ আল্লাহর পথে ব্যয় না করা পর্যন্ত তা পবিত্র হতে পারে না। 'আল্লাহর পথে' শব্দটির অর্থ কি ? আল্লাহ কারোর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন নেই, তিনি অভাবীও নন। কাজেই তাঁর পথ বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, বিত্তশালীদের সম্পদ ব্যয় করে জাতির দরিদ্র ও অভাবী লোকদেরকে সচ্ছল করার চেষ্টা করতে হবে এবং এমন সব কল্যাণমূলক কাজে এ সম্পদ নিয়োগ করতে হবে—যা থেকে সমগ্র জাতি লাভবান হতে পারবে।

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ (التوبة : ٦٠)

"মূলত সাদকা-যাকাত হচ্ছে ফকির[১] ও মিসকিনদের[২] জন্য এবং তাদের জন্য যাদেরকে সাদকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত করা হয়, তাদের জন্য যাদের হৃদয়কে শক্তিশালী করার প্রয়োজন হয়[৩], লোকদেরকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য, ঋণগ্রস্তদের ঋণমুক্ত করার জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য এবং মুসাফিরদের[৪] জন্য।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

এটিই মুসলমানদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি, তাদের ইনস্যুরেন্স কোম্পানী এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড। এখান থেকেই মুসলিম সমাজের বেকারদেরকে সাহায্য করা হয়। তাদের অক্ষম, বিকলাংগ, রুগ্ন, এতিম, বিধবা ও কর্মহীনদেরকে এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রতিপালন করা হয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, এ বস্তুটি মুসলমানদেরকে ভবিষ্যৎ অন্ন সংস্থানের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে। এর সহজ-সরল নীতি হচ্ছে, আজ এক ব্যক্তি বিত্তবান কাজেই সে অন্যকে সাহায্য করবে, আগামীকাল যখন সে অভাবী হয়ে পড়বে তখন অন্যরা তাকে সাহায্য করবে। দরিদ্র হয়ে পড়লে আমার অবস্থা কি হবে, একথা চিন্তা করার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। মরে গেলে স্ত্রী ও ছেলে-পেলেদের কি অবস্থা হবে ? কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পড়লে, পীড়িত হয়ে পড়লে ঘর-বাড়ীতে আগুন লেগে গেলে, বন্যা কবলিত হয়ে পড়লে, দেউলিয়া হয়ে গেলে তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে এবং এসব বিপদের হাত থেকে উদ্ধারের কি উপায় হবে—এসব চিন্তা করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। সফর অবস্থায় টাকা-পয়সা শেষ হয়ে গেলে জীবিকা নির্বাহের কি উপায় হবে ? একমাত্র যাকাত ব্যবস্থাই এ সমস্ত চিন্তা থেকে মানুষকে চিরন্তন মুক্তি দান করে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী সমাজের একজন সদস্যের কাজ কেবল এতটুকুই

১. ফকির এমন সব লোকদেরকে বলা হয় যারা নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে কম অন্ন সংস্থান করার কারণে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী।–(লিসানুন আরব)

২. মিসকিনের সংজ্ঞা বর্ণনা করে হযরত ওমর (রা) বলেছেন ঃ যারা অর্থ উপার্জন করতে পারে না অথবা অর্থ উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। এ সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে যে দরিদ্র শিশু এখনো অর্থ উপার্জনের যোগ্যতা রাখে না এবং যেসব বেকার ও রুগ্নব্যক্তি সাময়িকভাবে উপার্জনের যোগ্যতা বঞ্চিত—তারা সবাই মিসকিন।

৩. এ দলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এমন সব নও-মুসলিম যারা কুফর থেকে ইসলামে প্রবেশ করার কারণে সংকটে জর্জরিত হয়েছে।

৪. মুসাফির ব্যক্তির গৃহে সম্পদের প্রাচুর্য থাকলে ও সফর অবস্থায় অর্থ সংকটে পড়লে অবশ্যই যাকাত গ্রহণের হকদার।

থাকে যে, সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদের একটি অংশ আল্লাহর ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে জমা দিয়ে বীমা করে নেবে। প্রকৃতপক্ষে এ সময় এ অর্থের তার কোনো প্রয়োজন নেই। এ অর্থ এখন যাদের প্রকৃত প্রয়োজন তাদের কাজে লাগবে। কাল যখন তার বা তার সন্তান-সন্ততিদের প্রয়োজন দেখা দেবে তখন কেবল তার নিজের প্রদত্ত সম্পদই নয় বরং তার চাইতে অনেক বেশী সম্পদ ফেরত পাবে।

এখানে আবার দেখা যায়, পুঁজিবাদ ও ইসলামের নীতি ও পদ্ধতির মধ্যে পরিপূর্ণ বৈপরীত্য। পুঁজিবাদের দাবী হচ্ছে, অর্থ সঞ্চয় করতে হবে এবং তার পরিমাণ বাড়াবার জন্য সুদ নিতে হবে। যার ফলে এ নালা দিয়ে গড়িয়ে আশে-পাশের লোকদের সবার টাকা-পয়সা এ পুকুরে এসে পড়বে। বিপরীত পক্ষে ইসলাম নির্দেশ দেয়, প্রথমত টাকা-পয়সা জমা করে বা আটকে রাখা যাবে না আর যদি কখনো জমা হয়ে যায় তাহলে এ পুকুর থেকে নালা কেটে দিতে হবে, যাতে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষেতগুলোতে পানি পৌঁছে যায় এবং আশেপাশের সমস্ত জমি তরতাজা ও সবুজে শ্যামলে ভরে উঠে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধন আবদ্ধ ও জমাটবদ্ধ হয়ে থাকে কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় তা মুক্ত, স্বাধীন ও অবাধ গতিশীল। পুঁজিবাদের পুকুর থেকে পানি নিতে হলে প্রথমে আপনার পানি সেখানে অবশ্যই থাকতে হবে, নয় তো এক কাতরা পানি আপনি সেখান থেকে পেতে পারেন না। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থার পুকুরের নিয়ম হচ্ছে এই যে, যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকবে সে তার বাড়তি পানি ঐ পুকুরে ঢেলে দিয়ে যাবে এবং যার পানির প্রয়োজন হবে সে ওখান থেকে নিয়ে যাবে। বলাবাহুল্য মৌলিকত্ব ও স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে এ দু'টি পদ্ধতি পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। একটি অর্থব্যবস্থায় এ দুই বিপরীতধর্মী মতাদর্শকে একত্রিত করা কোনো ক্রমেই সম্ভবপর নয়। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ ধরনের বিপরীতধর্মী মতাদর্শের একত্র সমাবেশের কথা কল্পনাই করতে পারে না।

পাঁচ ঃ মীরাসী আইন

নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয়, আল্লাহর পথে ব্যয় ও যাকাত আদায় করার পরও যে অর্থ-সম্পদ কোনো একস্থানে কেন্দ্রভূত হয়ে যাবে তাকে বিকেন্দ্রীভূত করার জন্য ইসলাম আর একটি পন্থা অবলম্বন করেছে। একে বলা হয় মীরাসী আইন। এ আইনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করবে তা যতো কম বা বেশী হোক না কেন, তা কেটে টুকরো টুকরো করা হবে এবং নিকট-দূরের সকল আত্মীয়ের মধ্যে

ক্রমানুসারে বণ্টন করা হবে। যদি এমন কোনো ব্যক্তি থাকে, যার কোনো ওয়ারিস নেই তাহলে তাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করার অধিকার দানের পরিবর্তে তার সম্পদ মুসলমানদের বায়তুলমালে জমা করে দিতে হবে। তাহলে সমগ্র জাতি এ থেকে লাভবান হতে পারবে। মীরাস বণ্টনের এ আইনের অস্তিত্ব একমাত্র ইসলামেই দেখা যায়, অন্য কোনো অর্থব্যবস্থায় এর অস্তিত্ব নেই। অন্যান্য অর্থব্যবস্থা এ ব্যাপারে যে নীতি নির্ধারণ করেছে তা হচ্ছে, এক ব্যক্তি যে অর্থ সঞ্চিত করে রেখে যায় তার মৃত্যুর পর তা এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট কেন্দ্রীভূত থাকে।[১] কিন্তু ইসলাম অর্থ কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্তে তার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতি, এর ফলে অর্থের আবর্তন সহজতর হয়।

ছয় ঃ গনীমত লব্ধ সম্পদ ও বিজিত সম্পত্তি বণ্টন

এ ক্ষেত্রেও ইসলাম একই দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। যুদ্ধে সেনাবাহিনী যে গনীমতের অর্থ (শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত সম্পদ) হস্তগত করে সে সম্পর্কে ইসলাম একটি বিশিষ্ট আইন প্রণয়ন করেছে। এ অর্থ-সম্পদ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। চারভাগ সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয় এবং অবিশিষ্ট এক ভাগ সাধারণ জাতীয় কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার জন্য রেখে দেয়া হয়।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ (النفال : ٤١)

"জেনে রাখো, গনীমত হিসেবে তোমরা যাকিছু হস্তগত করো তার এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর রসূল, রসূলের নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ৪১)

আল্লাহ ও রসূলের অংশ বলে এমন সব কাজকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশের আওতাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে দেয়া হয়েছে।

যাকাতে রসূলের নিকটাত্মীয়দের কোনো অংশ ছিল না বলে এখানে তাদের অংশ রাখা হয়েছে।

অতপর এ পঞ্চমাংশে আরো তিন শ্রেণীর অংশ বিশেষভাবে রক্ষিত হয়েছে। জাতির এতিম শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে জীবন সংগ্রামে অংশ নেয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য এতে তাদের অংশ

১. জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্থলাভিষেক (Primogeniture) এবং একান্নবর্তী পরিবার (Joint Family System) প্রথা এ নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

রক্ষিত হয়েছে। মিসকিনদের অংশ রাখা হয়েছে—বিধবা মহিলা, বিকলাঙ্গ, অক্ষম, রুগ্ন ও অভাবী প্রভৃতি যার অন্তর্ভুক্ত। আর রাখা হয়েছে ইবনুস সাবীল অর্থাৎ মুসাফিরদের অংশ। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে মুসাফিরকে আপ্যায়ণ করার প্রবণতা সৃষ্টি করেছে। এ সঙ্গে যাকাত, সাদকা ও যুদ্ধলব্ধ গনীমতের সম্পদেও তার অংশ রেখেছে। এ ব্যবস্থার কারণে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্রমণ-পর্যটন, শিক্ষা-অধ্যয়ন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী পরিদর্শন ও অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য যাতায়াত সহজতর হয়েছে।

যুদ্ধের ফলে ইসলামী রাষ্ট্র যেসব সম্পদ-সম্পত্তির মালিক হয় ইসলাম সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন রাখার বিধান দিয়েছে।

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى

وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ط

.... لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ

.... وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ....

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ ـ(الحشر : ٧ ـ ١٠)

“জনপদের অধিবাসীদের নিকট থেকে আল্লাহ, ‘ফায়’ (বিনা যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যেসব সম্পদ হস্তগত হয়) হিসেবে যাকিছু দান করেছেন তা আল্লাহ, তাঁর রসূল, রসূলের নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য, যাতে এগুলো কেবলমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। .... আর এর মধ্যে অভাবী মুহাজিরদেরও অংশ রয়েছে, যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সহায়-সম্পদ থেকে বেদখল করে নির্বাসিত করা হয়েছে। ..... আর তাদের অংশ রয়েছে যারা মুহাজিরদের আসার আগে মদীনায় ঈমান এনেছিল। ..... আর তাদের পরে ভবিষ্যত আগমনকারী বংশধরদেরও অংশ রয়েছে।”–(সূরা আল হাশর ঃ ৭-১০)

এ আয়াতগুলোতে কেবলমাত্র ‘ফায়’ লব্ধ অর্থের ব্যয় ক্ষেত্রগুলোর বিশদ বর্ণনা করা হয়নি বরং এই সঙ্গে যে উদ্দেশ্যে ইসলাম ফায়লব্ধ অর্থ-সম্পদ বণ্টন তথা সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে সেদিকেও সুস্পষ্ট ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ যেন কেবলমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। কুরআন মজীদ ছোট একটি বাক্যের মধ্যে যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছে সেটিই হচ্ছে সমগ্র ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর।

সাত ঃ মিতব্যয়ীতার নির্দেশ

ইসলাম একদিকে ধন-সম্পদ সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে আবর্তন করার ও ধনীদের সম্পদ থেকে নির্ধনদের অংশ লাভ করার ব্যবস্থা করেছে, অন্যদিকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হবার নির্দেশ দিয়েছে। এভাবে অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কখনো প্রান্তিকতার আশ্রয় নিয়ে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করবে না। এ ক্ষেত্রে কুরআনের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ○ (بنى اسرائيل : ٢٩)

"আর নিজের হাত না একেবারে গলায় বেঁধে রাখো আর না একেবারে তাকে খুলে দাও, যার ফলে পরবর্তীকালে আক্ষেপ করে বসে থাকার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯)

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ○

"আর আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দারা যখন ব্যয় করে, অমিতব্যয় করে না আবার কার্পণ্যও করবে না বরং এ দুটির মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করে।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৭)

এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে থেকেই অর্থ ব্যয় করে। তার অর্থ ব্যয় যেন কখনো এমন পর্যায়ে না পৌঁছায় যার ফলে তা তার আয়ের অংককে ছাড়িয়ে যায় এবং নিজের আজেবাজে খরচের জন্য তাকে অন্যের দ্বারে হাত পাততে হয় অথবা অন্যের উপার্জনে ভাগ বসাতে হয় এবং যথার্থ প্রয়োজন ছাড়াই অন্যের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। অতপর গায়ের জোরে সে ঋণদাতাকে কাঁচকলা দেখিয়ে ফিরবে অথবা ঋণ আদায় করার জন্য নিজের সব রকমের অর্থনৈতিক উপকরণ ব্যবহার করে অবশেষে ফতুর হয়ে ফকির ও মিসকিনদের খাতায় নিজের নাম লেখাবে। আবার সে যেন নিজের অর্থনৈতিক সামর্থের তুলনায় অনেক কম খরচ করার মতো কার্পণ্যও না দেখায়। নিজের আয় ও অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের সীমার মধ্যে থেকে ব্যয় করার অর্থ এ নয় যে, সে ভালো আয়-উপার্জন করলে নিজের সব টাকা-পয়সা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আয়েশ-আরাম ও ভোগ বিলাসীতায় উড়িয়ে দেবে আর অন্যদিকে তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীরা চরম সংকটের মধ্যে দিন যাপন করবে। এ ধরনের স্বার্থান্ধ ব্যয় বাহুল্যকে ইসলাম অমিতব্যয়িতার মধ্যে গণ্য করেছে।

وَاٰتِ ذَالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ○

"নিজের নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার পৌঁছিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরদেরকেও তাদের অধিকার দান করো। বাজে খরচ করো না। যারা অযথা ও বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রব-প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ—না-ফরমান।"

–(বনী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭)

ইসলাম এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নৈতিক শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং এ সঙ্গে কার্পণ্য ও অমিতব্যয়িতার চূড়ান্ত অবস্থা প্রতিরোধের জন্য আইনও প্রণয়ন করেছে। ধন বণ্টনের ভারসাম্য বিনষ্টকারী সমস্ত পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। জুয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে। মদ্যপান ও ব্যভিচারের পথ রোধ করেছে। অনর্থক ফূর্তিবাজী, তামাশা ও কৌতুকের এমন ব্যয়বহুল অভ্যাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যেগুলোর অনিবার্য পরিণতি অর্থ ও সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। সঙ্গীতের স্বাভাবিক প্রবণতাকে এমন পর্যায়ে উপনীত হতে দেয়নি যেখানে সঙ্গীত প্রিয়তা ও সঙ্গীতের মধ্যে ঐকান্তিক মগ্নতা মানুষের মধ্যে বহুবিধ নৈতিক ও আত্মিক ত্রুটি সৃষ্টির সাথে সাথে তার অর্থনৈতিক জীবনেও বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ হয়। সৌন্দর্য পিপাসার স্বাভাবিক প্রবণতাকেও একটি সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করে। বহু মূল্য, পরিচ্ছদ, হীরা ও মণি-মানিক্যের অলংকার, সোনা ও রূপার তৈজস পত্রাদি, চিত্র ও ভাস্কর মূর্তি সম্পর্কে রসূলে করীম (স)-এর যে নির্দেশাবলী বিধৃত হয়েছে তার মধ্যে বহুতর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ সমস্ত কল্যাণের মধ্যে একটি মহত্তর কল্যাণ হচ্ছে এই যে, যে ধন-সম্পদ বহুসংখ্যক দরিদ্র ও অভাবী ভাইদের জীবনের নিম্নতম অপরিহার্য প্রয়োজনাদি পূর্ণ করতে পারে এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে দিতে পারে, তাকে নিছক নিজের দেহ ও গৃহ সজ্জায় ব্যয় করা সৌন্দর্যপ্রীতি নয় বরং নিকৃষ্ট পর্যায়ের হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতার পরিচায়ক।

মোটকথা ইসলাম একদিকে নৈতিক শিক্ষা ও অন্যদিকে সুনির্দিষ্ট আইন-কানুনের মাধ্যমে মানুষকে সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবনযাপনের নির্দেশ দেয়। এ অনাড়ম্বর জীবনে মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার সীমানা কোনোক্রমেই এতটা ব্যাপকতর হতে পারে না, যার ফলে মধ্যম মানের আয়-উপার্জনের সংসার চালানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং নিজের স্বাভাবিক সীমার বাইরে গিয়ে তাকে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসাতে হবে অথবা যদি সে মধ্যম মানের অধিক আয় করতে সমর্থ হয়, তাহলে নিজের উপার্জিত সমস্ত অর্থ-

সম্পদ নিজেই ভোগ করবে এবং নিজের অপারগ ভাইদের সাহায্য করবে না, যারা মধ্যম মানের কম উপার্জন করে থাকে।

একটি প্রশ্ন

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ইসলামের সমগ্র অর্থব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এ আলোচনাটি পড়ার ও বারবার বিশ্লেষণ করার পর বিবেচনা করুন এ ব্যবস্থার কোন্‌খানে সুদকে বসানো যায়? এ ব্যবস্থার যথার্থ প্রাণবস্তু, এর গঠনাকৃতি, এর বিভিন্ন অংশ ও তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে বলুন, এর মধ্যে সুদী লেন-দেনের কোনো অবকাশ বা প্রয়োজন আছে কি? এখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কোনো স্থান বা প্রয়োজন আছে কি? এসব প্রশ্নের জবাব অবশ্যই নেতিবাচক হতে বাধ্য। তাহলে এ ক্ষেত্রে পুনর্বার গভীর দৃষ্টিতে আলোচনাটি পর্যালোচনা করে বলুন, এর মধ্যে নৈতিক, তমদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোথাও কোনো ত্রুটি দেখা যায় কি? নৈতিকতা ও তমদ্দুনের উন্নততর নীতি ও আদর্শের কথা না হয় বাদই দিলেন। যদি মনে করেন, মানুষের জীবনে অর্থনীতির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী, তাহলে আসুন, নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করুন। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি ও বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ের মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে কি? যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে এর মধ্যে কি এমন কোনো সংশোধনী পেশ করা যায়, যা গ্রহণ না করলে এ ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে? এর চেয়ে উন্নততর এমন কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পেশ করা যেতে পারে কি, যেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যকার অধিকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে এর চেয়েও অধিক নির্ভুল ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কল্যাণের সমান সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে এর চেয়ে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে? যদি এটিও সম্ভবপর না হয় এবং আমরা বিশ্বাস করি, এটি কোনোক্রমেই সম্ভবপর হতে পারে না, তাহলে আপনার মতে বুদ্ধি-বিবেচনা কি একথাই দাবী করে যে, নিজের দুর্বলতার কারণে দুনিয়ার এ সর্বোত্তম অর্থব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে আপনি দুনিয়ার নিকৃষ্টতম, সর্বাধিক ভ্রান্তিপূর্ণ ও ফলাফলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ধ্বংসকর অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? উপরন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর আপনি লজ্জিতও হবেন না, নিজের বিবেককে পাপের বোঝা বইতেও প্রস্তুত করবেন না এবং পাপকে পুণ্য, ফাসেকি ও সীমালংঘনকে আনুগত্য গণ্য করার জন্য কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের মনগড়া ব্যাখ্যা করতে থাকবেন এবং ঐ ভ্রান্ত অর্থব্যবস্থার যাবতীয় গলিত নীতি ইসলামের পবিত্র-পরিচ্ছন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে জুড়ে দেবার চেষ্টা করবেন, এ ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি, প্রাণসত্তা ও প্রকৃতির সাথে ঐ বস্তুগুলোর যতই বৈসাদৃশ্য

থাক না কেন আপনি তার কোনো পরোয়াই করবেন না। প্রথমে আপনি ডাক্তার প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র ফেলে দেন, তাঁর বিধৃত স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলী অবহেলা ও অস্বীকার করেন, যেসব বস্তু-বিষয় থেকে তিনি সতর্ক থাকতে ও আত্মরক্ষা করতে বলেছেন সেগুলো থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেন না। অবশেষে যখন রোগ বেড়ে যায় এবং মৃত্যু নিকটবর্তী হয় তখন আবার ঐ ডাক্তারকেই বলতে থাকেন, যে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র আমাকে রোগগ্রস্ত করেছে আপনি নিজের হাতে আমাকে সে ব্যবস্থাপত্রটি লিখে দেন, যেসব অনিয়ম, অনাচার ও অখাদ্য আমার সর্বনাশ সাধন করেছে আপনি আমাকে সেগুলোর অনুমতি দেন, যে বস্তুটিকে আপনি হলাহল গণ্য করেছিলেন সেটিকে আবেহায়াত বলে ঘোষণা করে দেন। মূলত এটি চূড়ান্ত পর্যায়ের বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রমসমস্যা ও তা সমাধানের পথ[১]

বর্তমানে শিল্প শ্রমিক (Industrial Labourers) এবং কৃষক সমাজ যেসব জটিলতা ও সমস্যায় নিমজ্জিত, তার মূল কারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকৃতি। আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকৃতির জন্যে দায়ী হলো সেই অধপতিত সমাজ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার একটি অংশ মাত্র। যতোদিন গোটা জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন না হবে এবং তার ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও কল্যাণমুখী হবে না, ততোদিন শ্রমজীবী মানুষের এসব সমস্যা এবং জটিলতাও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হতে পারে না।

বিকৃতির কারণ

বর্তমানে আমাদের দেশে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তা কেবল ইংরেজ শাসনের স্মারকই নয়, বরঞ্চ ইংরেজ শাসনের পূর্ব থেকেই এ ব্যবস্থায় ঘুণে ধরেছিলো। শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী (র)-এর রচনাবলী থেকে জানা যায়, তখনো লোকেরা অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে চিৎকার করতো, তখনো লোকেরা অর্থনৈতিক শোষণের কবলে নিষ্পেষিত হতো। ইংরেজরা এসে সে সময়কার অন্যায় ও বিকৃতির সাথে আরো অসংখ্য অন্যায় এবং বিকৃতি যোগ করে দিলো, তারা পূর্বের তুলনায় আরো নিকৃষ্টতর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিলো।

ইংরেজ আমলে অন্যায় আর বিকৃতি বৃদ্ধি পাবার একটি কারণ হলো এই যে, তারা ছিলো নিরেট বস্তুবাদী সভ্যতার পতাকাবাহী। দ্বিতীয়ত, সে সময়টা ছিলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উত্থানকাল। পুঁজিদাররা ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিয়ন্ত্রণমুক্ত। তৃতীয় কারণটি হলো, ইংরেজরা তো এসেছিলো সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিলের জন্যে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো এদেশের লোকদের সহায় সম্পদ লুটপাট ও শোষণ করে তাদের নিজ জাতির স্বার্থ হাসিল করা। এ তিনটি কারণের সমন্বয়ে তাদের চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থা পরিণত হয় যুলুম শোষণের হাতিয়ারে।

পরবর্তীকালে আমরা তাদের গোলামী থেকে মুক্তি পেয়েছি বটে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, তাদের চলে যাবার পরও তাদের রেখে যাওয়া

---

১. এ অংশটি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের সেই বক্তৃতার অংশ, যা তিনি ১৯৫৭ সালের ১৩ই মে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান লেবার ওয়েলফেয়ার কমিটির কনভেনশনে প্রদান করেছিলেন।–সংকলক

ব্যবস্থায় কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এর কারণ হলো, এ রাজনৈতিক বিপ্লব তো কোনো প্রকার নৈতিক ও আদর্শিক চিন্তা-চেতনাজাত চেষ্টা সংগ্রামের ফলে সাধিত হয়নি ; বরঞ্চ এ ছিলো একটি কৃত্রিম বিপ্লব। এ বিপ্লব সাধিত হয় কেবল একটি রাজনৈতিক টানা হেঁচড়ার ফলশ্রুতিতে। স্বাধীনতা লাভের একদিন আগেও কারো কাছে ভবিষ্যতের কোনো পরিকল্পনা ছিলো না। কোনো একটি জীবন ব্যবস্থার সুস্পষ্ট রূপ-কাঠামো বর্তমান ছিলো না। জাতির সামনে এমন পরিকল্পনা ছিলো না যা বাস্তবায়নের জন্যে তারা অগ্রসর হতে পারতো।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশের কোনো একটি অন্যায় অপরাধ ও বিকৃতি কমেনি, বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইংরেজরা পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং বস্তুবাদের বুনিয়াদের উপর যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলো আজো তাই হুবহু প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এর পরিবর্তন করা তো দূরের কথা বরং তার গোড়াতেই পানি ঢালা হচ্ছে। সেই ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্যে যেসব আইন তৈরী করা হয়েছিলো, দেশ স্বাধীন হবার পর তাতে কিছুমাত্র পরিবর্তন পরিমার্জনের প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করা হয়নি। ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে মজবুত করার জন্যে যেসব আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি তৈরি করেছিলো, সেগুলো এখনো সেভাবেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। দেশ চালাবার সেই নীতিই কার্যকর রয়েছে, এমনকি তাদের প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থা আজও চালু রয়েছে।

আমাদের স্বাধীনতা যদি নৈতিক ও আদর্শিক চেষ্টা সংগ্রামের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে লাভ করা হতো, তাহলে পয়লা দিন থেকেই আমাদের সামনে একটি পরিকল্পনা থাকতো, যা দেশে বাস্তবায়ন করা হতো। এ পরিকল্পনা অনেক আগেই তৈরী করে রাখা হতো এবং স্বাধীনতা লাভের পর একটি দিনও নষ্ট না করে আমরা পরিকল্পিত পথে চলতে শুরু করতাম। কিন্তু তা হয়নি। তাই আজ আমাদের গোলামী যুগের অন্যায় অনাচার কমার পরিবর্তে বেড়েই চলেছে, বরং ইংরেজ আমলের অন্যায় অনাচারের সাথে এখন আমাদের স্বাধীন দেশে আরো হাজারো অন্যায় অনাচারের সংযোজন করা হয়েছে এবং সেগুলোকে দুধকলা খাইয়ে তরক্কি দেয়া হচ্ছে।

আসল প্রয়োজন

এখন আমাদের আসল প্রয়োজন হলো সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন। যতোক্ষণ পর্যন্ত একাজ করা না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো

অসুবিধা, কোনো অভিযোগ এবং কোনো বিকৃতি পুরোপুরি দূর হওয়া অসম্ভব। যাবতীয় বিকৃতির আসল দাওয়াই হলো গোটা জীবন ব্যবস্থাকে তার আদর্শিক ও নৈতিক ভিত্তিমূল সহ পাল্টে দেয়া এবং তাকে অন্য এমন একটি নৈতিক ও আদর্শিক ভিত্তিমূলের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া, যা হবে সামাজিক সুবিচারের (Social Justice) গ্যারান্টি। জীবন ব্যবস্থার এরূপ পরিবর্তন হলে সুবিচার এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর তখন শ্রমজীবী মানুষের যাবতীয় সমস্যা এবং অভিযোগ অনায়াসে দূরীভূত হয়ে যাবে।

আমাদের মতে সত্যিকারভাবে সামাজিক সুবিচারের গ্যারান্টি দিতে পারে এমন জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি কেবল ইসলামই সরবরাহ করতে পারে। আর সেই জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যেই আমরা আমাদের সমস্ত চেষ্টা তৎপরতা নিয়োগ করেছি। আজকাল বহুলোক ইসলামী ইনসাফের বিভিন্ন রকম ধারণা পেশ করছে। তাদের কারো ইসলামী ইনসাফের ব্যাখ্যা এক রকম আবার অপর কারো মতে আরেক রকম। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, ইসলামী সুবিচারের আসল ধারণা এবং রূপ কাঠামো ইসলামের আসল উৎস কুরআন এবং সুন্নাহতেই বর্তমান রয়েছে। এ সুবিচারের সেই ব্যাখ্যাই কেবল গ্রহণযোগ্য যার স্বপক্ষে কুরআন সুন্নাহর দলীল প্রমাণ বর্তমান পাওয়া যাবে। আর মুসলিম উম্মাহর জনগণই ফায়সালা করবে যে, কোন্ ব্যাখ্যাটি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য আর কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ব্যাখ্যার বিভিন্নতা দেখে পেরেশান হবার কোনো কারণ নেই। কুরআন সুন্নাহর আদর্শিক ভিত্তি ও মূলনীতির উপর যে গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ তা সুবিচারের গ্যারান্টি দেবে।

সমস্যার সমাধান

কিন্তু যতোদিন জীবন ব্যবস্থার এ আমূল ও সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন না হবে, ততোদিন যতোটা সম্ভব সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। শ্রমজীবী জনগণের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্যে যা কিছু করা সম্ভব তা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার অবহেলা করা যাবে না। শ্রমজীবী জনগণের সমস্যাকে পুঁজি করে তাদেরকে ইসলাম ছাড়া অন্য মতবাদ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না।

এ তিনটি বিষয়ের মধ্যে শেষোক্তটি কিছুটা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। পৃথিবীতে বিভিন্ন মানুষের মানসিকতা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন

এক ব্যক্তি রোগযন্ত্রণায় মাটিতে পড়ে ছটফট ও আর্তনাদ করছে। আরেক ব্যক্তি তার এ অবস্থা দেখে ভাবলো, এ লোকটির কাছে যা কিছু আছে তা লুটে নেয়া, তার রোগ যন্ত্রণার সুযোগে আমার স্বার্থ হাসিল করা এবং তার বিপদকে আমার স্বার্থোদ্ধারের কাজে ব্যবহার করার এইতো মহাসুযোগ। অপর এক ব্যক্তি লোকটির অবস্থা দেখে ভাবলো, যতোক্ষণ তার পূর্ণ চিকিৎসার ব্যবস্থা না হবে ততোক্ষণ আমাকে তার জন্যে ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা করতে হবে এবং যতোটা সম্ভব তার যন্ত্রণা কমানোর চেষ্টা করতে হবে। শ্রমজীবী শ্রেণীর ব্যাপারে বর্তমানে এ উভয় ধরনের মানসিকতাই কাজ করছে। শ্রমজীবী মানুষ বর্তমানে কঠিন সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাদেরকে সীমাহীন কষ্ট এবং সমস্যায় নিমজ্জিত করে রেখেছে। একদল মানুষ তাদের এ সমস্যাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। তাদের আসল উদ্দেশ্য এদের সমস্যা ও অভিযোগ দূর করা নয় ; বরঞ্চ এদের সমস্যা আরো বৃদ্ধি করা এবং এদেরকে আরো অধিক দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত করা। এদের কোনো সমস্যা দূর করা সম্ভব হলেও তা দূর না করে বরং এদের দুঃখ-কষ্ট আরো বৃদ্ধি করে এবং এদেরকে উচ্ছৃংখলতার দিকে ঠেলে দিয়ে আইন শৃংখলার বিধিবন্ধন চুরমার করে দিয়ে এদেরকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাই তাদের উদ্দেশ্য।

সমাজতন্ত্রীরা যে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে শ্রমিকদের স্বর্গ বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তা হলো শ্রমিকদের জাহান্নাম। একথা সূর্যালোকের মতো সত্য যে, শ্রমিকদের আসল দুর্ভাগ্য শুরু হবে সেদিন থেকে যেদিন আল্লাহ না করুক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রমিকরা আজো অবর্ণনীয় দুরবস্থায় আছেন একথা ঠিক, কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যে অবস্থায় নিমজ্জিত হবেন, তা কল্পনা করতেও শরীর শিউরে উঠে। আজ তো আপনারা আপনাদের দাবি দাওয়া পেশ করতে পারছেন, দাবি মানা না হলে ধর্মঘট করতে পারছেন, সভা সমাবেশ এবং মিছিল মিটিং করতে পারছেন, সকলের কানে আপনাদের আওয়াজ পৌঁছে দিতে পারছেন, প্রয়োজনে এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় কর্মসংস্থানের চেষ্টা করতে পারছেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক স্বর্গরাজ্যে এসব কিছুর দরজাই সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। কারণ সে রাজ্যে সকল কলকারখানা, জমি, সংবাদ মাধ্যম, সংবাদপত্র, যাবতীয় জীবনসামগ্রী এবং মতপ্রকাশের সমগ্র উপকরণ থাকবে কেবল সেই শক্তির হতে যার করায়ত্তে থাকবে পুলিশ, সিআইডি, সেনাবাহিনী, আইন আদালত এবং কারাগার। সে রাজ্যে

শ্রমিকরা যতো কষ্ট আর যাতনাই ভোগ করুক না কেন, টু শব্দটিও করতে পারবে না। সভা সমাবেশ, মিছিল ধর্মঘট ইত্যাদির তো প্রশ্নই উঠে না।

তাদের এ সমাজতান্ত্রিক স্বর্গরাজ্যে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে একাধিক দুয়ার খোলা থাকবে না। সারাদেশে জমিদার একজনই হবে। সকল চাষীকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তারই জমিতে চাষবাস করতে হবে। সারাদেশে কলকারখানার মালিক একজনই হবে। তার ওখানে শ্রম দেয়া ছাড়া শ্রমিকদের জন্য শ্রম দেয়ার দ্বিতীয় কোনো জায়গা থাকবে না। পারিশ্রমিক সে যা দেবে শ্রমিককে তাই গ্রহণ করতে হবে, তাতে তার সংসার চলুক বা না চলুক, তাতে মালিকের কিছু যাবে আসবে না। সেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই সমাজতন্ত্রীরা শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। এ উদ্দেশ্যেই তারা গরীব শ্রেণীর মানুষের সমস্যাকে পুঁজি হিসেবে লুফে নেয় যাতে তাদের সমস্যার কোনো সমধান না হয়। এভাবে তারা এদের উস্কিয়ে এবং উত্তেজিত করে পরিবেশ পরিস্থিতির কোনো অবনতি ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানোর জন্যে এদেরকে ব্যবহার করতে চায়।

তারা কৃষক শ্রমিকদের এই বলে প্রতারিত করে যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে জমিদার এবং পুঁজিবাদের হাত থেকে সমস্ত জমি এবং কারখানা ছিনিয়ে এনে শ্রমিকদের মালিকানায় অর্পণ করা হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনা হবে এর উল্টো। জমি এবং কারখানা ছিনিয়ে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করা হবে। রাষ্ট্রই হবে সমস্ত জমি ও কারখানার মালিক। কৃষকদের বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রের অনুগত কৃষক এবং শ্রমিকে পরিণত হয়ে থাকতে হবে। সমাজতন্ত্রীরা সারাবিশ্বে শ্রমিকদের জন্যে ধর্মঘটের অধিকার দাবি করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু বিশ্বের যেখানেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে সর্বপ্রথম শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার হরণ করে নেয়া হয়েছে। তারা শ্রমিকদের বলে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকদের এমন কোনো অভিযোগ আপত্তিই থাকবে না যার ফলে ধর্মঘট করার প্রয়োজন পড়বে। অথচ এটি একটি সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। যেখানে কোটি কোটি মানুষ গুটিকয়েক শাসক ব্যক্তির অধীনে কাজ করবে সেখানে কর্মচারীদের কখনো অভিযোগ সৃষ্টি হবে না, তা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। প্রশ্ন হলো, তাদের মধ্যে যদি কোনো অভিযোগ সৃষ্টি হয়, তাহলে তা পেশ করার জন্য তারা কি কোনো সংস্থা বা সমিতি গঠন করতে পারবে ? তারা কি কোনো স্বাধীন সংগঠন তৈরী করতে পারবে, যার মঞ্চে দাঁড়িয়ে তারা নিজেদের দাবি উত্থাপন করতে পারবে ? তারা কি

কোনো স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম পাবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের দুঃখ কষ্টের কথা প্রকাশ করতে পারবে ? অভিযোগ উচ্চারণের সাথে সাথেই তো তারা কারা প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য হবে।

এসব কারণে আমরা মনে করি, কৃষক এবং শ্রমিকদের সাথে পুঁজিপতি জমিদার এবং কারখানা মালিকরা আজ যে যুল্‌ম করছে তার চেয়েও কঠিনতর যুল্‌ম করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সমাজতন্ত্রীরা—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে।

সংস্কারের মূলনীতি

পক্ষান্তরে আমরা চাই, সামাজিক সুবিচারপূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে ; আর তার পূর্বে যতোটা সম্ভব শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করতে। আমরা কোনো প্রকার রাজনৈতিক এজিটেশনের জন্য তাদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবো না, আর অপর কাউকেও ব্যবহার করতে দেবো না।

আমরা শ্রেণীসংঘাত সমর্থন করি না। আমরা বরং শ্রেণীচেতনা এবং শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্ব মিটিয়ে দিতে চাই। কোনো সমাজে মূলত ভ্রান্ত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কারণেই বিভিন্ন শ্রেণী সৃষ্টি হয়। নৈতিক অধঃপতন তাদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা জাগ্রত করে তোলে। আর যুল্‌ম-শোষণ, অন্যায়-অবিচার তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে শ্রেণীসংঘাত।

আমরা সমাজকে এক দেহের বিভিন্ন অংগের মতো মনে করি। একটি দেহের বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগ থাকে এবং প্রতিটি অংগেরই অবস্থান কর্মক্রিয়া পৃথক পৃথক হয়ে থাকে ; কিন্তু পায়ের সাথে হাতের, হৃদপিণ্ডের সাথে মস্তকের কোনো সংঘাত হয় না। বরং মানবদেহ এভাবেই জীবিত থাকে যে, তার প্রতিটি অংগ নিজ নিজ অবস্থানে থেকে স্বীয় কর্ম ও দায়িত্ব সম্পাদনের মাধ্যমে অপরাপর অংগের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে। আমরা চাই, ঠিক অনুরূপভাবেই মানব সমাজের প্রতিটি অংগ (সদস্য) নিজ নিজ অবস্থানে থেকে স্বীয় যোগ্যতা-দক্ষতা ও জন্মগত শক্তি সামর্থ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অপরাপর অংগের সাথী বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করবে এবং তাদের মাঝে শ্রেণীসংঘাত তো দূরের কথা শ্রেণীচেতনা পর্যন্ত জাগ্রত হবে না।

আমরা চাই, শ্রমদাতা এবং শ্রমগ্রহীতা প্রত্যেকে নিজের অধিকারের আগে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত ও সচেতন হবে এবং তা

যথার্থভাবে সম্পাদনের চিন্তা করবে। মানুষের মধ্যে যতো বেশী দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি পাবে ততোই সংঘাত দূর হতে থাকবে এবং সমস্যার জন্ম হবে খুবই কম।

আমরা মানুষের মধ্যে নীতিবোধ এবং নৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে চাই। আমরা 'নৈতিক মানুষ'কে সেই 'যালিম পশুর' থাবা থেকে মুক্ত করতে চাই, যে মানুষের উপর চেপে বসে আছে। মানুষের ভেতরের এ নৈতিক মানুষ যদি তার উপর জেঁকে বসা পশুত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সঠিকভাবে কাজ করতে আরম্ভ করে তবে অন্যায় আর বিকৃতির উৎসই শুকিয়ে যাবে।

আমাদের মতে সংস্কারপন্থীদেরকে একই সাথে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের কাজও করে যেতে হবে আর সেই সাথে শ্রমগ্রহীতা এবং শ্রমদাতা উভয়কেই সঠিক পথ দেখাতে হবে।

শ্রমগ্রহীতাদের বলতে চাই, আপনারা যদি নিজেদের কল্যাণ চান এবং নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করতে না চান, তবে অধিক অধিক অর্থোপার্জনের ধান্দায় অন্ধ হয়ে যাবেন না, হারাম খাবেন না। অবৈধ পথে অর্থোপার্জন ত্যাগ করুন, অবৈধ পথে মুনাফা করা পরিত্যাগ করুন। আপনারা যাদের শ্রম গ্রহণ করছেন তাদের বৈধ অধিকার উপলব্ধি করুন এবং তা যথাযথভাবে প্রদান করুন। দেশের উন্নতির যাবতীয় সুবিধা কেবল নিজেরাই কব্জা করে রাখবেন না। বরঞ্চ তা জাতির সাধারণ মানুষের হাতেও পৌঁছতে দিন, যাদের সামষ্টিক চেষ্টা-সাধনা এবং সামষ্টিক উপায় উপকরণের সাহায্যে এ উন্নতি সাধিত হচ্ছে তাদেরকে ন্যায্য অংশ দান করুন। কেবল পুঁজি দিয়েই সম্পদ অর্জিত হয় না বরঞ্চ সেই সাথে যোগ্য ব্যবস্থাপনা, দক্ষ কর্মী ও কারিগর এবং কায়িক শ্রম অপরিহার্য। এসবগুলোর সমন্বয়েই মুনাফা অর্জিত হয়। আর সেই মুনাফারই অপর নাম হলো অর্থসম্পদ। এ অর্থসম্পদ অর্জনের ব্যাপারে রাষ্ট্র নামক গোটা সমাজব্যবস্থাই সাহায্যকারী হয়ে থাকে। এসব মুনাফা যদি সুবিচারের সাথে সকল উৎপাদক মণ্ডলীর মাঝে বণ্টন করা হয় এবং ইসলাম নিষিদ্ধ যাবতীয় পন্থাপদ্ধতি যদি পরিহার করা হয়, তবে এসব ধ্বংসাত্মক আন্দোলন সৃষ্টি হবার কোনো অবকাশই সৃষ্টি হবে না, যা শেষ পর্যন্ত আপনাদেরই ধ্বংসের কারণ হয়।

শ্রমজীবীদের বলতে চাই, সুবিচারের দৃষ্টিতে আপনাদের বৈধ অধিকার কি তা আপনারা বুঝতে চেষ্টা করুন। সেই সম্পদের উপর

বিনিয়োগকারীদের ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্যিক দক্ষতা বিনিয়োগকারীদের এবং কারিগরি দক্ষতা প্রয়োগকারীদের বৈধ অংশ কতটুকু যা তাদের ও আপনাদের শ্রমের সংমিশ্রণের ফলে অর্জিত হয়, সেটা বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনারা আপনাদের অধিকারের জন্যে যে আন্দোলনই করুন না কেন তা যেনো অবশ্যি ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আপনারা কখনো নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে এমন অবাস্তব ও অতিশয় চিন্তা করবেন না ; যা শ্রেণী-সংগ্রামের প্রবক্তারা আপনাদেরকে তাদের সংঘাতের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে আপনাদের সামনে পেশ করছে। নিজেদের বৈধ অধিকারের জন্যে আপনারা যে চেষ্টা সংগ্রামই করুন না কেন তা যেনো অবশ্যি বৈধ উপায় এবং বৈধ পন্থায় পরিচালিত হয়। আপনারা যদি তাই করেন, তাহলে প্রত্যেক সত্যপন্থী ব্যক্তির কর্তব্য হবে আপনাদের সহযোগিতা করা।

দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমরা যেসব সংস্কার কাজ করতে চাই এখন আমি সেগুলো পেশ করছি ঃ

১. সুদ, প্রতিজ্ঞাপত্র, জুয়া ইত্যাদি হারাম ঘোষিত পন্থাপদ্ধতিকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। মানুষের জন্যে কেবল বৈধ উপার্জনের দুয়ারই খোলা রাখতে হবে। তাছাড়া অবৈধ পথে অর্থ ব্যয় করার পথও বন্ধ করে দিতে হবে। কেবল এভাবেই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার শিঁকড় কেটে দেয়া সম্ভব। আর সেই স্বাধীন ব্যবস্থাও কেবল এভাবে টিকে থাকতে পারে যা গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য।

২. এযাবত অবৈধ ও হারাম পথে এবং ভ্রান্ত ব্যবস্থাপনার কারণে সম্পদের যে অবিচারমূলক সঞ্চয় গঁড়ে উঠেছে তা অপনোদন করার জন্যে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সেসব লোকদের কঠোর জবাবদিহি করতে হবে, যাদের কাছে অস্বাভাবিক পথে অর্থসম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে। শুধু তাই নয় বরং সেই সাথে হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ তাদের থেকে ফেরতও নিতে হবে।

৩. দীর্ঘকাল কৃষি জমির মালিকানার ব্যাপারে ভ্রান্ত ব্যবস্থা চালু থাকার কারণে যেসব অসম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো দূরীভূত করবার জন্যে ইসলামী শরীয়ার ঃ "অস্বাভাবিক অবস্থায় সংস্কারের এমন অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে যা ইসলামী নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না"—এ নীতির ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। এ নিয়মের ভিত্তিতে ঃ

ক. এমন সকল নতুন পুরাতন জমিদারী সম্পূর্ণরূপে খতম করে দিতে হবে, যা কোনো শাসনামলে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। কেননা শরয়ী দিক থেকে সেগুলোর মালিকানাই বিশুদ্ধ নয়।

খ. পুরাতন মালিকদের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত (যেমন একশো কিংবা দুশো একর) মালিকানা সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। এর অধিক মালিকানা সুবিচারমূলক দামে ক্রয় করে নিতে হবে। এ সীমা নির্ধারণের কাজ কেবল সাময়িকভাবে পুরাতন অসমতা দূর করার জন্যে করা যেতে পারে ; একে কোনো স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়া যাবে না। কেননা স্বতন্ত্র সীমা নির্ধারণ ইসলামের উত্তরাধিকার আইন এবং অন্যান্য শরয়ী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।

গ. সরকারী মালিকানাধীন হোক কিংবা উপরোল্লেখিত উভয় পন্থায় অর্জিত হোক অথবা নতুন বিরাজের মাধ্যমে চাষাবাদের উপযোগী হোক—সমস্ত জমি ভূমিহীন চাষী কিংবা স্বল্প জমির মালিকদের কাছে সহজ কিস্তিতে বিক্রয় করে দেয়ার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকার ঘেসা লোক কিংবা সরকারী কর্মকতার কাছে জমি সস্তায় বিক্রয় করে দেয়া কিংবা দান করে দেয়ার রীতি বন্ধ করে দিতে হবে। আর যাদেরকে এভাবে জমি প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে সে জমি ফেরত নিতে হবে। এছাড়া নিলামে বিক্রির পদ্ধতিও পরিত্যাগ করতে হবে।

ঘ. চাষাবাদের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে ইসলামী আইন প্রয়োগ ও অনুসরণ করতে হবে। অনৈসলামিক সকল পন্থা প্রক্রিয়া আইনগতভাবে বন্ধ করে দিতে হবে। এগুলো এজন্য করতে হবে, যেনো কোনো জমিদারী যুল্‌মে পরিণত হতে না পারে।

৪. পারিশ্রমিকের বেলায় বর্তমানে তাদের বেতন ক্ষেত্রে এক এবং একশতের তফাত বিরাজ করছে, এ ব্যবধান অবিলম্বে এক এবং বিশের মধ্যে নামিয়ে আনতে হবে। অতপর পর্যায়ক্রমে তা এক এবং দশের মধ্যে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া শ্রমিকদের পারিশ্রমিক এমন পর্যায়ে নির্ধারণ করতে হবে, যা সমকালীন মূল্যমানের হিসেবে একটি পরিবারের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে অপরিহার্য ।

৫. স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারিদেরকে বাসা, চিকিৎসা এবং সন্তান সন্ততির শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৬. সব ধরনের শিল্প কারখানায় শ্রমিকদেরকে নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন প্রদান ছাড়াও নগদ বোনাস দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া বোনাস শেয়ারের মাধ্যমে তাদেরকে শিল্প কারখানায় অংশীদার বানিয়ে নিতে হবে। যাতে সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের শ্রম যুক্ত হয়ে যে মুনাফা অর্জিত হবে তাতে তারা অংশীদার হয়।

৭. বর্তমান শ্রম আইন পরিবর্তন করে এমন একটি সুবিচারপূর্ণ আইন প্রণয়ন করতে হবে, যা পুঁজি এবং শ্রমের সংঘাতকে সহযোগিতায় পরিণত করে দেবে, শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে তাদের বৈধ অধিকার ফিরিয়ে দেবে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার ইনসাফপূর্ণ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করবে।

৮. রাষ্ট্রীয় আইন এবং ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক নীতিমালা (Policy) এমনভাবে সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে, যাতে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির একচ্ছত্র দখলদারী খতম হয়ে যায় এবং সমাজের সাধারণ মানুষ অধিক থেকে অধিকতর হারে শিল্পের মালিকানা ও মুনাফায় অংশীদার হতে পারে।

তাছাড়া আইন এবং নীতিমালার সেসব ত্রুটিও দূর করতে হবে, যেগুলোর কারণে লোকেরা অবৈধ মুনাফা করার সুযোগ পায় এবং কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে আল্লাহর সৃষ্টজীবের জন্যে জীবন যাপন কঠিন করে তোলে এবং জনগণকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে।

৯. যেসব শিল্প-কারখানা মৌলিক এবং ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত হলে সমাজ ও সমষ্টির জন্যে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হবে, সেগুলোকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় চালাতে হবে। তবে কোন্ কোন্ শিল্প-কারখানা জাতীয় মালিকানায় পরিচালিত হবে তা ফায়সালা করার দায়িত্ব জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদের (জাতীয় সংসদের) হাতে ন্যস্ত থাকবে। এ ধরনের ফায়সালা করার সময় জাতীয় সংসদকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, এসব শিল্প-কারখানা জাতীয় মালিকানায় আনার পর যেনো বুরোক্রেসীর সেই অতিপরিচিত দুশ্চরিত্রতা

ও ধ্বংসের শিকার না হয়। কারণ সে অবস্থায় কোনো শিল্প-কারখানা জাতীয় মালিকানায় পরিচালনা করাটা লাভজনক হবার পরিবর্তে নির্ঘাত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

১০. বর্তমানে যে ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা আসলে ইহুদী পুঁজিপতিদের দেমাগপ্রসূত। আমাদের দেশেও সে ব্যবস্থারই অনুকরণ করা হচ্ছে। এ ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিয়ে ইসলামের মুশারাকা, মুদারাবা ও পারস্পরিক সহযোগিতা নীতির ভিত্তিতে এর পুনরনির্মাণ করতে হবে। এ মৌলিক সংস্কার ছাড়া এ দুটি প্রতিষ্ঠানের বিপর্যয় কিছুতেই ঠেকানো যাবে না। এমনকি এগুলোকে পুরোপুরি জাতীয় মালিকানায় নিলেও নয়।

১১. আজ পর্যন্ত কোনো জীবন ব্যবস্থাই যাকাতের তুলনায় উত্তম সামাজিক নিরাপত্তার কোনো স্কীম প্রদান করতে পারেনি। যাকাত আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে জননিরাপত্তার এ ইসলামী স্কীমকে কার্যকর করতে হবে। এটা জননিরাপত্তার এমন এক নিশ্চিত ব্যবস্থা যা কার্যকর করা হলে দেশে কোনো ব্যক্তি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না।

১২. সর্বোপরি একথাটি খুব ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, কেবল অর্থনীতিই মানব জীবনের আসল এবং একমাত্র সমস্যা নয় ; বরং অর্থনীতি মানব জীবনের অন্যান্য বিষয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যতোদিন ইসলামের নির্দেশনা ও বিধানের আলোকে নৈতিক চরিত্র, পারস্পরিক সম্পর্ক, শিক্ষা-দীক্ষা, রাষ্ট্র-রাজনীতি, আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতির সকল বিভাগে পূর্ণাংগ সংস্কার সাধিত না হবে ততোদিন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সংস্কারের কোনো কর্মসূচিই সফল ও সুফলদায়ক হতে পারে না।

সমাপ্ত

"আর তাহাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে ভিক্ষুক ও দীনহীনদেরও অধিকার রয়েছে।"-আয্যারীয়াতঃ ১৯

"আল্লাহ তা'লার নেকবান্দা হলো ঐ সকল লোক যারা ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপব্যয়কে প্রশ্রয় দেয় না আর কৃপনতাও করে না। বরং এই দু'টি পথের মধ্যে অবস্থান করে ব্যয় করে থাকে।"- আল-ফুরকানঃ ৬৭